ইউনিট
১৪

দুগ্ধ খামার ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

আমাদের দেশে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধিতে, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ও দারিদ্র দূরীকরণে দুগ্ধ খামারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দুগ্ধ খামার স্থাপনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপই একই সুতোয় গাঁথা। খামার স্থাপনের পূর্বে যেমন বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা করে কাজ করতে হয় ঠিক তেমনি খামার স্থাপনের পর খামারের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি দিতে হয়। দুগ্ধ খামারের মূল উৎপাদিত দ্রব্য হচ্ছে দুধ। তাই দুধ বাজারজাতকরনের ব্যবস্থা সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। খামার স্থাপনের উদ্দেশ্যই হলো তা থেকে মুনাফা অর্জন করা। সুতরাং দুগ্ধ খামারের আয় ব্যয়ের হিসেব সম্পর্কেও জানা আবশ্যক।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের জাত নির্বাচন, গর্ভকালীন ও প্রসবকালিন গাভীর যত্ন, দুগ্ধবতী গাভীর যত্ন ও খাদ্য, নবজাত বাছুরের যত্ন, দুধ উৎপাদনে প্রভাবক বিষয়বসমূহ। বিশুদ্ধ দুধ উৎপাদন ও দুধ পরীক্ষা, দুধ সংরক্ষণ পদ্ধতি, বাণিজ্যিক ডেইরি ফার্ম পরিদর্শন ও প্রতিবেদন তৈরি, গর্ভবতী গাভী শনাক্তকরন নিয়ে তাত্বিক ও ব্যাবহারিকভাবে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১৪.১ : দুগ্ধবতী গাভীর জাত নির্বাচন
পাঠ - ১৪.২ : গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন গাভীর যত্ন
পাঠ - ১৪.৩ : দুগ্ধবতী গাভীর যত্ন ও খাদ্য
পাঠ - ১৪.৪ : নবজাতক বাছুরের যত্ন
পাঠ - ১৪.৫ : বিশুদ্ধ দুধ উৎপাদন ও সংরক্ষণ
পাঠ - ১৪.৬ : দুধ উৎপাদনের প্রভাবক বিষয়সমূহ
পাঠ - ১৪.৭ : ব্যবহারিকঃ বাণিজ্যিক ডেইরি ফার্ম পরিদর্শণ ও প্রতিবেদন তৈরি
পাঠ - ১৪.৮ : ব্যবহারিকঃ গর্ভবতী গাভী শনাক্তকরণ

পাঠ-১৪.১ দুগ্ধবতী গাভীর জাত নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- একটি উন্নত জাতের দুধালো গাভী চিহ্নিত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	দুগ্ধবতী গাভী, জাত, স্বাস্থ্যবান

উন্নত জাতের গাভীর লক্ষণ (Sign of Hybrid Cow)

একটি উন্নত জাতের দুধালো গাভীর লক্ষণগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১. উন্নত জাতের গাভী সামঞ্জস্যপূর্ণ নিখুঁত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সুন্দর ও আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী হবে।
২. পিছনের অংশ বেশি চওড়া এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পিছনের পা দুটি বেশি ফাঁক থাকে।
৩. দেহের আকার অনুপাতে বুকের ও পেটের বেড় গভীর হয়।
৪. ভালজাতের গাভীর পাঁজরগুলো আলাদা এবং স্ফীত দেখায়।
৫. দেহ বেশ বড় এবং দেহের আকার সামনের দিকে সরু এবং পিছনের দিকে ভারী হয়।
৬. চামড়া পাতলা ও মসৃণ প্রকৃতির হয়।
৭. ভালজাতের গাভীর শরীর ঢিলেঢালা ও নাদুশ-নুদুশ হয়।
৮. ওলান সুগঠিত নরম, আকারে বড়, চওড়া এবং ওলান শক্তভাবে শরীরের সাথে আটকানো থাকে।
৯. ওলানের বাঁট চারটি সমান আকৃতির ও সমান দূরত্বে অবস্থিত হবে।
১০. দুধ দোহনের আগে ওলান শক্ত থাকে এবং দোহনের পর চুপসে যায়।
১১. ওলানের সামনে নাভীর দিকে সুস্পষ্ট ও উন্নত দুগ্ধশিরা স্পষ্ট দেখা যায়।
১২. উন্নত জাতের গাভীর নাকের ছিদ্র বড় ও খোলা হয়।
১৩. একটি উন্নত ও স্বাস্থ্যবান গাভীর স্বভাব অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে দুগ্ধবতী গাভী এবং মহিষের জাত নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করবে এবং জানবেন।

সারসংক্ষেপ

দেশী গাভী সংকরায়নের মাধ্যমে উন্নত জাতের গাভীর উদ্ভাবন করা হয়েছে। সুষম খাদ্য প্রদান ও স্বাস্থ্যসম্মত পালন ব্যাবস্থার মাধ্যমে একটি সংকর বা উন্নত জাতের গাভী হতে দৈনিক ২৫ লিটার পর্যন্ত দুধ পাওয়া যায়। উন্নত জাতের গাভী সাধারনত ত্রিকোনাকৃতির হয়। এদের দেহের আকার অনুপাতে বুকের ও পেটের বেড় গভীর হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। উন্নত জাতের দুধালো গাভীর আকৃতি কেমন?
(ক) বর্গাকৃতি (খ) ত্রিকোনাকৃতি
(গ) আয়তকার (ঘ) চর্তুভুজাকৃতি

২। উন্নত জাতের দুধালো গাভীর পাঁজর কেমন হবে?
(ক) স্ফীত (খ) সরু
(গ) চিকন (ঘ) পাতলা

পাঠ-১৪.২ গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন গাভীর যত্ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গর্ভকালীন গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- প্রসবের সময় গাভীর কী ধরনের ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন তা বলতে পারবেন।
- প্রসবের পর কী করতে হবে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	গর্ভকালীন, প্রসবকালীন, যত্ন, পরিচর্যা

গাভী থেকে সুস্থ সবল বাছুর পেতে হলে পাল দেওয়ার পর থেকে শুরু করে বাচ্চা প্রসবের পর পর্যন্ত সময়টুকুতে সঠিক যত্ন ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হয়। সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে গাভী ও বাছুরের মারাতক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। ফলে গাভী পালন লাভজনক না হয়ে লোকসানে পর্যবসিত হতে পারে।

২.১. গর্ভকালীন গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা

গাভীর গর্ভধারণকালে গড়ে ২৮০ দিন। প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম যেভাবেই পাল দেওয়া হোক না কেনো কখন পাল দেওয়া হয়েছে সেই সময়টি মনে রাখতে হবে এবং প্রতিটি গাভীর স্বাস্থ্য রেকর্ড পরীক্ষার মাধ্যমে গাভী গর্ভধারণ করেছে কিনা এই বিষয়টিও নিশ্চিত হতে হবে। দুগ্ধবতী গাভীর ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় ৬ মাস পর্যন্ত যত্ন, পরিচর্যা, খাদ্য সরবরাহ ও দুধ দোহন স্বাভাবিকভাবেই চলবে। ছয় মাসের উর্ধ্বে গর্ভবতী গাভীকে দৈনিক খাদ্যেও অতিরিক্ত দানাদার খাদ্য দিতে হবে। গাভীর ওজন ২০০-৩০০ কেজি হলে ০.৫-১.০ কেজি, ৩০০-৪০০ কেজি হলে ১.০-১.৫ কেজি এবং ৪০০-৫০০ কেজি হলে ১.৫-২.৭৫ কেজি দানাদার মিশ্রণ দিতে হবে। বয়সভেদে অতিরিক্ত এই খাদ্য চাহিদাকে প্রেগনেন্সি এ্যালাউন্স (Pregnancy Allowance) বলে। গর্ভবতী গাভীকে এই বয়সে খাদ্য প্রদানে যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে তা হলো -(ক) গাভীর কোনভাবেই চর্বি জমতে দেওয়া যাবে না এবং (খ) দানাদার মিশ্রণের সাথে প্রয়োজন মোতাবেক ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। তবে বকনা বাছুরের ক্ষেত্রে পাল দেওয়ার পর থেকেই সুষম খাদ্য সঠিক পরিমাণে সরবরাহ করা উচিত। কারণ এই সময় গর্ভের বাচ্চা ও বকনা বাছুরের শরীরের বৃদ্ধি একই সাথে ঘটে থাকে। গর্ভবতী বকনা বা গাভীকে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস জাতীয় খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ খাদ্য সরাবরাহ করা উচিত। গর্ভাবস্থায় বকনা/গাভী যেনো প্রচুর পরিমাণ পরিষ্কার পানি খেতে পারে সে ব্যবস্থা রখতে হবে। নিম্নে ৬ মাসের অধিক গর্ভবতী গাভীর ওজন ও দুধ উৎপাদনের ভিত্তিতে দৈনিক খাদ্য তালিকা দেওয়া হলো:

সারনি–১ : ৬ মাসের অধিক গর্ভবতী গাভীর ওজন ও দুধ উৎপাদনের ভিত্তিতে দৈনিক খাদ্য চাহিদা।

		দৈহিক খাদ্য চাহিদা (কেজি)			
গাভীর ওজন (কেজি)	দুধ উৎপাদন (কেজি)	আঁশ জাতীয় খাদ্য (কাঁচা ঘাস/খড়)		দানাদার খাদ্য	
		গর্ভবতী নয়	গর্ভবতী ৬ মাসের অধিক	গর্ভবতী নয়	গর্ভবতী ৬ মাসের অধিক
৩০০	২.০	৩৬.০/৯	৩০.০/৭.৫০	১.০০	১.৫০
৪০০	২.০	৪০.০/১০.০	৩৬.০/৯.০	২.০০	৩.৫০

কাঁচা ঘাস এবং শুকনা খড়ের মিশ্রণ আনুপাতিক হারে সরবরাহ করতে হবে। সাধারণত চার কেজি কাঁচা ঘাস মোটামুটিভাবে এক কেজি শুকনা খড়ের সমতূল্য। দানাদার মিশ্রণ সব সময় সহজ লভ্য ও সস্তা খাদ্য উপাদান দিয়ে তৈরি করতে হবে। তবে এ জন্য পুষ্টি মাত্রার ব্যাঘাত ঘটানো যাবে না। দানাদার খাদ্যের মিশ্রিণ তৈরির জন্য বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের ব্যবহারিক মাত্রার একটি হিসাব নিচে দেয়া হলো।

খাদ্যের নাম	গঠন (শতকরা হার)
ক) দানাদার খাদ্য (গম/ভূট্টা/খেসারি ভাংগা)	১৫-২৫
খ) ভূষি ও কুড়া (গম/চাল/খেসারি)	৪৫-৫৫
গ) খৈল (তিল/নারিকেল/তুলা বীজ)	১৫-২০
ঘ) মাছের গুড়া/সয়াবিন মিল	৪-৫
ঙ) খনিজ ও লবণ (লবণ ১.০% এবং হাড়ের গুড়া/লাইম স্টোন পাউডার/ ঝিনুকের পাউডার/ডিমের খোসার পাউডার ইত্যাদি ৩-৪%)	৪-৫

প্রসবের প্রায় দু সপ্তাহ পূর্ব থেকে বকনা বা গাভীকে একটু বড় ধরনের ঘরে পৃথকভাবে খোলা অবস্থায় রাখতে হবে। প্রতিদিন হাঁটাচলার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিষ্কার নরম বিছানার ব্যবস্থা করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে গর্ভবস্থায় যেন কোনোভাবেই বকনা বা গাভী উত্তেজিত না হয় বা আঘাত না পায়। গরম হওয়া গাভী বা ষাঁড় যেন গর্ববতী বকনা বা গাভীর উপর লাফ না দেয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এই সময় বকনা বা গাভীর খাদ্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমিয়ে দিতে হবে। পায়খানা পরিষ্কার ও শরীর ঠান্ডা থাকে এ জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

প্রসবকালীন গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা

প্রসবের কিছু সময় পূর্ব থেকেই গাভীতে কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে যেমন- ওলান ফুলে যায়, ভালভা স্বাভাকিকের চেয়ে ২ থেকে ৬ গুণ বেশি ফুলে যায় এবং লেজের গোড়ার দিকে রস বের হতে থাকে। এই সময় গাভীকে প্রসূতি ঘরে নেওয়া উচিত। প্রসূতি ঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত হতে হবে এবং আলো বাতাস চলাচলের ও ভালো বিছানার ব্যবস্থা থাকতে হবে। আবার বর্ষাকালে এবং শীতকাল ব্যতিত অন্য সময়ে খামারের কাছাকছি পরিষ্কার ছায়াযুক্ত এবং ঘাস আছে এমন স্থানে ও নেওয়া যেতে পারে। প্রসবের সময় গাভীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাতে হবে। সাধারণত প্রসবের লক্ষণ প্রকাশ পাবার ১ থেকে ২ ঘন্টার মধ্যেই বাচ্চা প্রসব হয়ে থাকে। কিন্তু যদি প্রসব ব্যাথা শুরু হওয়ার ৪ ঘন্টার মধ্যে বাচ্চা প্রসব না হয় তবে পশু চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া উচিত। স্বাভাবিক বাচ্চা প্রসবের ক্ষেত্রে সাহায্য ছাড়াই গাভী সাধারণত বাচ্চা প্রসব করে থাকে। তবে অনেক সময় হাত দিয়ে সামান্য সাহায্য করতে হয়। প্রসবের শুরুতেই বাচ্চার সামনের পা বেরিয়ে আসে, এরপর আসে নাক। যে কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই জরুরী ভিত্তিতে পশু চিকিৎসকের সাহায্যে নেওয়া উচিত।

প্রসাবোত্তর গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা

- বাচ্চ প্রসবের পরপরই নিমপাতা বা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এর কিছু দানা সহযোগে পানি গরম করে গাভীর জননতন্ত্রের বাইরের অংশ, ফ্লাংক (Flank) এবং লেজ পরিষ্কার করতে হবে।
- গাভীর যাতে ঠান্ডা না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখাতে হবে।
- বাচ্চা প্রসবের পরপরই গাভীকে হালকা গরম পানি বা এধরনের পানি দিয়ে গুড়ের সরবত তৈরি করে খাওয়ানো ভালো।
- গাভী যাতে নবজাতক বাছুরকে চাটতে পারে এজন্য বাছুরকে গাভীর কাছে যেতে দিতে হবে।
- প্রসবের পরপরই গাভীকে আংশিকভাবে দোহন করতে হবে।
- সাধারণ প্রসবের ২-৪ ঘন্টার মধ্যেই গর্ভফুল (Placenta) বের হয়ে যায়। যদি ৮-১২ ঘন্টার মধ্যেও যদি গর্ভফুল বের না হয় তবে গাভীকে আরগট মিশ্রণ খাওয়ানো যেতে পারে। ১২ ঘন্টার পরেও গর্ভফুল বের না হলে পশুচিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া উচিত।
- গর্ভফুল বের হওয়ার সাথে সাথে তা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। গাভী যেনো গর্ভফুল না খেয়ে ফেলে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।
- দুধজ্বর ও ম্যাস্টাইটিস রোগের সম্ভাবনা কমাবার জন্য বাচ্চা প্রসবের পর ১-২ দিন পর্যন্ত গাভীকে সম্পূর্ণভাবে দোহন না করাই ভালো। বাছুরকে কাচলা দুধ বা কলস্ট্রাম খাওয়ানোর জন্য ওলানের বাঁট চুষতে দিতে হবে।

গাভীকে প্রথমত হালকা গরম পানিতে গমের ভূষি ভিজিয়ে খেতে দিতে হবে। একইসাথে অল্পপরিমাণ কাঁচা ঘাস ও খাওয়ানো যেতে পারে। বাচ্চা প্রসবের ২ দিন পর থেকে গাভীকে দানাদার খাদ্য খাওয়ানো শুরু করতে হবে। দানাদার খাদ্যের পরিমাণ এমনভাবে বাড়াতে হবে যাতে বাচ্চা প্রসবের ১৫ দিন পর থেকে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন গাভীর যত্ন নিয়ে আলোচনা করবে এবং জানবেন।

সারসংক্ষেপ

সুস্থ-সবল বাচ্চা পেতে এবং গাভীকে রোগমুক্ত ও অধিক উৎপাদনশীল রাখতে হলে গর্ভাবস্থায় প্রসবের সময় এবং প্রসবের পর বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হবে। গর্ভবস্থায় গাভীকে আরামদায়ক বাসস্থান ও উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। প্রসবের সময় গাভীরে প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে পশুচিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে। গর্ভফুল বের হওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নিয়মমাফিক খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সাধারনত প্রসবের কত ঘন্টার মধ্যে গর্ভফুল বের হয়ে আসে?
(ক) ৫-৬ ঘন্টা (খ) ২-৪ ঘন্টা
(গ) ২-৪ ঘন্টা (ঘ) ৭-৮ ঘন্টা

২। প্রসবের সময় বাচ্চার শরীরের কোন অংশ প্রথম বের হয়ে আসে?
(ক) মাথা (খ) পেছনের পা
(গ) সামনের পা (ঘ) নাক

৩। একটি সুষম খাদ্য মিশ্রণে দানাদার খাদ্যের পরিমান কত?
(ক) ১০-১.৫% (খ) ১৫-২০%
(গ) ১৫-২৫% (ঘ) ২৫-৩০%

৪। প্রসবের লক্ষন প্রকাশ পাবার কত ঘন্টার মধ্যে বাচ্চা প্রসব হয়?
(ক) ২-৩ ঘন্টা (খ) ১-২ ঘন্টা
(গ) ৪-৫ ঘন্টা (ঘ) ৭-৮ ঘন্টা

পাঠ-১৪.৩ দুগ্ধবতী গাভীর পরিচর্যা ও খাদ্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গাভীর পরিচর্যা বলতে কী বোঝায় তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- গাভী পরিচর্যার বিভিন্ন কৌশলগুলো আলোচনা করতে পারবেন।
- দুগ্ধবতী গাভীর সুষম খাদ্য তেরির প্রক্রিয়া জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	দুগ্ধবতী, পরিচর্যা, খাদ্য

দুগ্ধবতী গাভীর পরিচর্যা

গাভী পরিচর্যার লক্ষ্য হলো গাভী যাতে সার্বক্ষনিক স্বাস্থ্যবতী ও কর্মক্ষম থাকে সে ব্যবস্থা করা। গাভী পরিচর্যার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে। যথা- স্বাস্থ্য ও হাববাবগত পরিচর্যা, সাধারণ বদঅভ্যাস বা দোষত্রুটি নিরাময়গত পরিচর্যা, প্রজনন ও প্রসবগত পরিচর্যা এবং দোহনকালের পরিচর্যা ইত্যাদি।

১। স্বাস্থ্য ও হাবভাবগত পরিচর্যা

স্বাস্থ্য ও হাবভাবগত পরিচর্যা বলতে সাধারণ স্বাস্থ্যের উপর শুভ প্রতিক্রিয়া করে এমন ধরনের কর্মকান্ড সম্পাদনকে বুঝায়। যেমন- গাভীর শরীর আচড়ানো (grooming), ব্যায়াম, খুর কাটা, শিং সাজানো ও শিংছেদন (dehorning) ইত্যাদি। এসব পরিচর্যায় গাভীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং উৎপাদনে শুভ প্রভাব পড়ে।

২। সাধারণ বদঅভ্যাস বা দোষত্রুটি নিরাময়

কোনো গাভীর মধ্যে দুধ দোহনের সময় দোহনকারিকে লাথি মারা, নিজের বাট চোষা বা ঘরের বেড়া ভাঙ্গা প্রভৃতি বদঅভ্যাস দেখা যায়। একবার এসব বদঅভ্যাস কোনো গাভীকে পেয়ে বসলে তা ঠিক করা বেশ কঠিন। তবে উপযযক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে কিছু দোষত্রুটি নিরাময় করা সম্ভব। যেমন- দুধ দোহনের সময় লাথি মারা সাধারণত প্রথামবার বাচ্চা দেয়া বা নবীন গাভীর (heifer) বেলায় দেখা যায়। এক্ষেত্রে গাভীর লাথি মারার প্রকৃত কারণ জেনে সে অনুযায়ী তা প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ না জেনে আন্দাজের ওপর প্রতিকারের ব্যাবস্থা নিলে গাভীর মধ্যে এটি সব সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে পারে। তখন সে গাভীর দুধ দোহনের জন্য শিকল বা রশি দিয়ে তা দুপা বাধা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এ রকম আরও যে সব বদঅভ্যাসের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো নিরাময়ের কিছু পন্থা উদ্ভাবন করা যেতে পারে। যেমন- বাট চোষনের বেলায় শিকল বা ষাঁড়ের নাকে পরানোর আংটি গাভীর নাকে পরিয়ে দেয়া যায় অথবা কাঁটাযুক্ত ঠোনা বা ঠুলি চাপিয়ে দিলে গাভী বাট চুষতে পারে না। বেড়া ভাঙ্গার অভ্যাস নিরাময় কঠিন, তবে আক্রমণাত্মক দোষযুক্ত হলে গাভীর নাকে শক্ত হাতে ঘুষি মারা যেতে পারে।

৩। প্রজনন ও প্রসবগত পরিচর্যা

গাভীর প্রজনন ও প্রবসগত পরিচর্যা করতে হলে এদের শারীরতন্ত্রের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। গাভীর গর্ভধারণকাল ও ঋতুচক্রের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ২৮১±৫ ও ২১±৩ দিন। বাচ্চা প্রসবের ৭৫-১১০ দিনের মধ্যে গাভীকে পাল দেয়ানো উচিত। প্রসব ও পরবর্তী গর্ভধারণের মধ্যে ৬০ দিনের বেশি ছাড় দেয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা এ সময়ের মধ্যে জরায়ু স্বাভাবিক হয়ে থায়। এসব বিষয় বিবেচনা করে গাভীর পরিচর্যা করতে হবে। এতে গাভীর দুধ উৎপাদন সঠিক হবে। কোনো গাভীকে এববার করে গর্ভধারণ করাতে যে সংখ্যক পাল দিতে হয় সে সংখ্যা দিয়ে তার প্রজনন দক্ষতা (Breeding Efficiency) যাচাই করা হয়। গর্ভধারন ও প্রসবকালে গাভীকে সঠিকভাবে যত্ন ও পরিচর্যা করতে হয়। এ সময় অবহেলা ও অবজ্ঞা করলে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া গাভীর প্রজনন ও গর্ভধারণ ক্ষমতা ও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রসবকাল যতই অগ্রসর হয় ততই গাভীর বহিঃযৌনাঙ্গের চামড়া মসৃণ হয়ে ওঠে। লেজের দুপাশের লিগামেন্ট অবসন্ন হয়ে পড়ে ও ওলান ফুলে ওঠে। গাভীর মধ্যে অস্থির ভাব দেখা যায়। এ সময় গাভীকে নিকটস্থ পশু হাসপাতালে নিয়ে ভেটেরিনারি সার্জনের

সাহায্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হয। গাভীকে রেচক খাবার যেমন- ভুষি, ও খৈল খেতে দিতে হবে। প্রসবের প্রথম লক্ষণ দেখা দিলেই গাভীকে শান্ত রেখে পর্যবেক্ষণ করা উচিত যাতে প্রাকৃতিকভাবে এবস কাজটি নির্বিঘ্নে হতে পারে। যদি ২/৩ ঘন্টা পর প্রসব প্রক্রিয়া আর অগ্রসর না হয় তাহলে নিকটস্থ ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শ নিতে হবে। এ সসময় জরায়ুতে বাছুরের অবস্থান নিরীক্ষণ করা দরকার। যদি সামনের পা দুটো ও মাথার অবস্থান সামনের দিকে না হয় তাহলে ভেটেরিনারি সার্জনের সহায়তা নেয়া অপরিহার্য। বাছুর ভূমিষ্ট হলে ২/৩ দিন গাভীর সাথে ছেড়ে দেয়াই উত্তম। প্রতিটি পর্যায়ে লক্ষ্যে রাখতে হবে যাতে বাছুর ও গাভী কোনো দুর্বিপাকে না পড়ে। বাছুর প্রসবের পর গাভীকে খাবার ও ঈষদুষ্ণ পরিস্কার পানি পরিবেশন করতে হবে। এরপর ২/৩ দিন রেচক খাবার পরিবেশন বাঞ্ছনীয়। গাভীর গর্ভফুল (placcnta) না পড়া পর্যন্ত সযত্ন দৃষ্টি রাখতে হবে। বাছুরের নাভী নির্জীবাণু পন্থায় কাটা প্রয়োজন। বাচ্চা প্রসরের পর গাভীর ওজন কমে যায়। বেশি খাবার পরিবেশন করে ও সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে তা পুষিয়ে দিতে হবে।

৪। দুগ্ধ দোহনকালের পরিচর্যা

দুগ্ধ দোহন নিজেই একটি অতিসংবেদনশীল প্রক্রিয়া। দোহনের মূল লক্ষ্য হলো এমনভাবে দোহন করতে হবে যাতে ওলান থেকে সম্পূর্ণ দুধ পটনে বের করে আনা যায়। ওলান থেকে দুধ ছেড়ে দেয়া (let down) একটি প্রতিবর্ত ক্রিয়া যা সম্পূর্ণ দোহনে অত্যাবশ্যক। সুতরাং সকল প্রকার ভিতিপ্রদ ও নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ থেকে গাভীকে মুক্ত রাখতে হবে। দুধ দোহনের সময় দুটো অত্যাবশ্যক কাজ সম্পদান করতে হবে, যথা- ১. অযথা গাভীকে উত্তেজিত করা থেকে বিরত থাকা এবং ২. দ্রুততার সাথে দোহনকাজ শেষ করা। দুধ দোহনকালে গাভীকে সম্পূর্ণ শান্ত ও সুস্থির রাখতে হবে। এ সময় মশামাছি উৎপাত করলে গাভীর দোহন প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে। গাভী পরিচর্যার আর একটি লক্ষন হচ্ছে গাভীকে পোকামাকড় ও মশামাছি থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা। তাছাড়া গাভীর পেটে যাতে কৃমির ডিম প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য খাদ্য পরিবেশনে সদাসতর্ক থাকতে হবে।

দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্য

জীবনধারণের জন্য একদিকে যেমন সুষম খাদ্যের প্রয়োজন, দুধ উৎপাদনের জন্য তেমনি অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। তাই প্রয়োজনীয় উৎপাদন পেতে হলে গাভীকে সব সময় সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। সুষম খাদ্য না খাওয়ালে গাভীর দুধ উৎপাদন কমে যাবে, গাভী দুর্বল হয়ে পড়বে। এক সময় গাভী প্রজনন ক্ষমতা হারিয়ে ধীরে ধীরে অনুর্বর ও বন্ধ্যা হয়ে যাবে। অপর্যাপ্ত খাদ্য খাওয়ালে গাভীর উৎপাদন ক্ষমতা লোপ পায়। তাই প্রতিটি গাভীকে নিম্নোক্ত নিয়ম অনুযায়ী দৈনিক সুষম খাদ্য খাওয়াতে হবে।

দুগ্ধবতী গাভীর দৈনিক সুষম খাদ্য তালিকা

১. সবুজ কাঁচা ঘাস-১৫-২০ কেজি। ২. শুকনা খড়-৩-৫ কেজি। ৩. দানাদার খাদ্য মিশ্রণ-২-৩ কেজি। ৪. লবণ-৫৫-৬০ গ্রাম। ৫. পানি-পর্যাপ্ত পরিমাণ

গাভীর দানাদার খাদ্য মিশ্রণ তৈরি

গাভীর ১০ কেজি ওজনের একটি দানাদার খাদ্য মিশ্রণ তালিকা নিম্নে দেয়া হল-

১.	চাউলের কুঁড়া	-	২ কেজি।
২.	গমের ভুসি	-	৫ কেজি।
৩.	খেসারি ভাঙা	-	১.৮ কেজি।
৪.	তিল বা বাদাম খৈল	-	১ কেজি।
৫.	লবণ	-	০.১ কেজি।
৬.	খনিজ মিশ্রণ	-	০.১ কেজি।
	মোট	=	১০.০০ কেজি।

গাভীকে যে পরিমাণ খাদ্য পরিবেশন করতে হয় তা থাম্বরুল (Thumb rule) অনুযায়ী নিরুপণ করা যেতে পারে। যেমন-

১. প্রতি ১.৫ লিটার দুধ উৎপাদনের জন্য গাভীকে খড় ও কাচা ঘাসের সাথে প্রতিদিন ০.৫ কেজি দানাদার খাদ্য দিতে হবে।

২. শুধু খড় খাওয়ালে প্রতি ১.২৫ লিটার দুধ উৎপাদনের জন্য প্রতিদিন ০.৫ কেজি অতিরিক্ত দানাদার খাদ্য প্রদান করতে হবে।

৩. প্রতি ১০ কেজি শারীরিক ওজনের জন্য একটি গাভীর দৈনিক ২-৩ কেজি শুকনা খাদ্য গ্রহনের দরকার হয়। শুকনা খড় খাওয়ানোর পরিবর্তে যদি খড় ছোট ছোট করে কেটে খুদের ভাত বা ভাতের মাড়ের সাথে গমের ভুষি, চাউলের গুড়া, তিলের খৈল, লবণ ও কিছু ঝোলাগুড় একত্রে মিশিয়ে খাওয়ানো যায় তাহলে খাবারের পুষ্টিমান অনেক বেড়ে যাবে। ফলে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে। শুকনা খড় খাওয়ানোর পরিবর্তে খড়কে ইউরিয়া দ্বারা প্রক্রিয়াজাত করেও গাভীকে খাওয়ানো যায়। এতে একদিকে যেমন গাভীর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে অন্যদিকে উৎপাদন ভাল হবে। গমের ভুসি, ঝোলাগুড়, ইউরিয়া, লবণ, ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ সহযোগ ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক তৈরি করে গাভীকে খাওয়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়। গাভীকে দৈনিক প্রচুর পরিমাণে কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হবে। কাঁচা ঘাস না খাওয়ালে দুধ উৎপাদন কম হবে। বর্তমানে দেশে উন্নত জাতের অনেক বিদেশী ঘাস বাংলাদেশে গোখাদ্য হিসেবে চাষ করা হয়। যেমন- নেপিয়ার, পারা, জার্মান, গিনি ইত্যাদি। এসব ঘাসের ফলন বেশি এবং পুষ্টিমানও বেশি হয়। গাভীকে থাম্বরুল অনুসারে নিম্নরুপভাবে খাবার দেয়া যেতে পারে।

ক) গাভীকে প্রতিদিন তার ইচ্ছা অনুযায়ী মোটা আঁশযুক্ত খাবার খেতে দিতে হবে।

খ) একটি দুগ্ধবিহীন দেশী জাতের গাভীকে দৈনিক ১.৫-২ কেজি দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে।

গ) দুগ্ধবিহীন একটি উন্নত জাতের গাভীকে দৈনিক ৩-৪ কেজি দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে।

ঘ) প্রতি গাভী থেকে ১.৫ লিটার দুধ বেশি উৎপাদন করতে চাইলে গাভীকে অন্যান্য স্বাভাবিক খাদ্যের সাথে প্রতিদিন অতিরিক্ত ১/২ কেজি দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে।

ঙ) দানাদার খাদ্য দুভাগে ভাগ করে প্রতিদিন সকাল ও বিকালে দুবার খাওয়াতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে দুগ্ধবতী গাভীর যত্ন ও খাদ্য নিয়ে আলোচনা করবে এবং জানবে।

সারসংক্ষেপ

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দুভাবে গাভী পালন করা হয়, যথা- ১. চারনভূমিতে গরু চরানোর মাধ্যমে ও ২. গোশালায় বেঁধে রেখে খাদ্য পরিবেশন ও মলমূত্র নিষ্কাশনের মাধ্যমে। এদেশে গোশালা বা গোয়াল ঘরে গাভী পালনই সমাদ্রিত। গাভীর বাসস্থান তৈরির মূলে থাকছে নিরাপত্তা ও দুর্যোগদুর্বিপাক থেকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। গাভীর গর্ভধারনকাল ও ঋচক্রের দৈর্ঘ যথাক্রমে কত?

(ক) ২৮১±৫ ও ২১±৩ দিন (খ) ২৮০±২ ও ১৮±৩ দিন

(গ) ২৭০±৩ ও ২৫±৩ দিন (ঘ) ২৭৫±৫ ও ২১±২ দিন

২। বাছুরের জন্মের কত দিন পর্যন্ত গাভীকে রেচক খাবার দেয়া উচিত?

(ক) ১০/১২ দিন (খ) ৭/৮ দিন

(গ) ২/৩ দিন (ঘ) ৮/১০ দিন

৩। শুধু খড় খাওয়ালে ১.২৫ লিটার দুধ উৎপাদনে জন্য প্রতিদিন গাভীকে কতটুকু দানাদার খাদ্য প্রদান করতে হবে?

(ক) ১.০ কেজি (খ) ০.৭ কেজি

(গ) ০.৫ কেজি (ঘ) ০.৮ কেজি

পাঠ-১৪.৪ নবজাতক বাছুরের যত্ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাছুরের বাসস্থানের বৈশিষ্ট্যসমূহ বলতে ও লিখতে পারবেন।
- বাছুরের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ লিখতে পারবেন।
- বাছুরের পরিচর্যার কৌশলগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাছুরের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টির পরিমাণ লিখতে পারবেন।
- বয়সভিত্তিতে বাছুরের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করতে পারবেন।
- বাছুরের রোগব্যাধি দমনের সাধারণ পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	নবজাতক, বাছুর, ট্যাগ, পর্যবেক্ষণ

দুগ্ধ খামারের ভবিষ্যত নির্ভর করে বাছুরের সন্তোষজনক অবস্থার ওপর। কারণ, আজকের বাছুরই ভবিষ্যতের দুধ উৎপাদনশীল গাভী, উন্নতমানের প্রজনন উপযোগী ষাঁড় বা মাংস উৎপাদনকারী গরু। তাই গাবাদিপশু পালনে বাছুর পালন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের দেশে যে সংখ্যক গবাদি পশু পালিত হয় তার মধ্যে শতকরা ২৪ ভাগের ও বেশি বাছুর। নবজাত বাছুরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় এরা অত্যন্ত রোগ সংবেদনশীল হয়। এমতাবস্থায় সামান্য যত্নের অভাবে বাছুর রোগে আক্রান্ত হতে পারে ও পরবর্তীতে এর মৃত্যুও ঘটতে পারে। তাই সুস্থ সবল বাছুর পেতে হলে একদিকে যেমন গর্ভাবস্থায় গাভীর সুষ্ঠু যত্ন ও পর্যাপ্ত সুষম খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন প্রসবকালিন গাভীর ও নবজাত বাছুরের সঠিক যত্ন। বাছুর পালনের কলাকৌশল সঠিকভাবে অবলম্বন না করায় প্রতিবছর বহু সংখ্যক বাছুর মার যায় এবং দেশের পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এতে জনসাধারণের আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ব্যাপক। তাই বাছুর পালনে যত্নবান হওয়া উচিত।

বাসস্থান ও পরিচর্যা

গরুমহিষের শৈশবকালকে বাছুর বলে। সাধারণত জন্মের পর থেকে এক বছরের কিছু বেশি বয়সের গরুমহিষের বাচ্চাই বাছুর নামে পরিচিত। এ সময়ে বাছুরের শারীরবৃত্ত ও শারীরিক গঠন বৈশিষ্ট্য সাপেক্ষে বাসস্থান তৈরি করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বাছুরের বয়স, খাদ্যভ্যাস, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আবহাওয়া ও রোগবালাই সংক্রমণ হওয়ার সম্ভব্যতাও বিবেচনা করতে হয়। বাছুরের বর্ধিষ্ণু শারীরবৃত্তের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং খাদ্য পরিবেশন যত্ন ও পরিচর্যার কথা বিবেচনা করে প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রতিরোধের জন্য বাসস্থান তৈরি করা উচিত। আমাদের দেশের বাছুরের জন্মের ওজন গড়ে ১৫-২০ কেজি হয়। অবশ্য উন্নত সংকর জাতের বাছুরের জন্মের ওজন ২৫-৩০ কেজি হয়ে থাকে। জাত ভিন্ন হওয়ায় তাদের বাসস্থান এবং পরিচর্যাও ভিন্ন হবে।

প্রতিটি বড় বাছুরের জন্য ১.৫২ মিটার × ২.১৩ মিটার = ৩.২৪ বর্গমিটার অর্থাৎ ৫ ফুট × ৭ ফুট = ৩৫ বর্গ ফুট জায়গার ভিত্তিতে বাসস্থান তৈরি করা যায়। এ বাসস্থানে প্রচুর আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে। আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা রেখে বৃষ্টিপাত ও বর্ষাকালের কর্দমাক্ত অবস্থা পরিহারের লক্ষ্যে পশুর বাসস্থান স্থাপন বাঞ্ছনীয়। এ বাসস্থান কাঁচা অথবা পাকা হতে পারে। এতে বাছুরের মলমূত্র নিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রতিটি ঘরে ছোট ছোট খোপ তৈরি করে প্রতি খোপে একটি করে বাছুর রেখে পালন করা যায়। সেক্ষেত্রে খোপগুলোর প্রতিটির পরিসর হবে ০.৯১ মিটার × ১.২২ মিটার × ১.০৭ মিটার অর্থাৎ ৩ ফুট × ৪ ফুট × ৩.৫ ফুট। অন্যদিকে, একটি নির্দিষ্ট আলোবাতাস ব্যবস্থাসম্পন্ন ঘরে একসাথে সমবয়সী ৫-১০টি বাছুর পালন করা যায়। তবে উভয়ক্ষেত্রেই ঘরের সামনে বেষ্টনি ঘেরা খোলা জায়গা থাকা দরকার যাতে বাছুর ব্যায়াম ও খেলাধুলা করতে পারে।

বাছুরের খোপে খড়বিচালি দিয়ে বিছানা তৈরি করতে হবে। মেঝে পাকা হলে ২.৫৪ সেমি বা এক ইঞ্চি পুরু বিছানার প্রয়োজন হয়। মেঝে কাঁচা হলে তা যেন কর্দমাক্ত ও স্যাঁতস্যাঁতে না হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা স্যাঁতস্যাঁতে ও নোংরা পরিবেশে বাছুর ফুসফুস প্রদাহ রোগ ভুগে থাকে। এ রোগ বাছুরের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়। ১.৫-২.০ মাস বয়সের বাছুরকে বড় বাছুরের বাসস্থানে স্থানান্তর করা উচিত যেখানে একসঙ্গে বাছুর প্রতিপালিত হয়। এক কথায় বাসস্থান হবে আলোকিত পরিষ্কার ও শুকনো।

বাছুরের পরিচর্যা

বাছুরের পরিচর্যা বলতে এদের খাদ্য পরিবেশন, রোগবালই মুক্ত রাখা, দেখাশোনা করা ইত্যাদি বুঝায়। আমাদের দেশে বাছুর প্রতিপালনে আলাদা কোনো যত্ন ও সেবার রেওয়াজ নেই। কিন্তু এটি পশু পালন বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাছুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে দৈহিক পরিপক্কতা অর্জন করে সাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত এদের পালন করা হয়। এ সময়কালটা বাছুরের জন্মের দিন থেকে ১৮০দিন পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে বাছুর পরিচর্যা কলাকৌশল বর্ণনা করা হয়েছে।

১। বাছুরকে গাভীর দুধ পান করা শেখানো

বাছুরকে দুধ পান করানো শেখাতে হয়। জন্মের পরই বাছুর তার মায়ের বাট থেকে দুধ চুষে নিতে পারে না। বাছুরকে তাই বাট মুখে পুরে দুধ টানা শেখাতে হয়। পারিবারিক খামারে তো বটেই, বৃহদাকার দুগ্ধ উৎপাদন খামরেও বাছুরকে হাতে তুলে পান করাতে হয়। গাভীর দুধ উৎপাদন ক্ষমতা কম হলে তো কথাই নেই। সেক্ষেত্রে মা গাভী থেকে দোহনকৃত দুধের অতিরিক্ত দুধ পান করানোর জন্য প্রয়োজন হতে পারে। বাছুরকে শৈশবে ৩৭.৫° ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দুধ পান করানো হয়। এর দুটো পদ্ধতি রয়েছে, যেমন- এক বোতলে করে ও দুই বালতিতে করে। তবে বোতলে (nipple feeding) করে দুধ পান করানোর সুবিধা হলো এতে অপেক্ষাকৃত ছোট ঢোকে দুধ বাছুরের পাকস্থলীতে ঢুকে থাকে। এখানে উল্লেখ্য বাছুরের পাকস্থলীর প্রকোষ্ঠ চারটি। বোতল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কোনো বিকল্প নেই। বিশুদ্ধ পানি ও গরুর দুধ ১:২ অনুপাতে মিশিয়ে পাতলা করে পান করানো উত্তম।

২। খামার পর্যায়ে বাছুর চিহ্নিতকরণ বা কানে ট্যাগ নম্বর লাগনো

বাছুর চিহ্নিতকরণের জন্য নির্জীবাণু পন্থায় কানে ট্যাগ নম্বর (tag numbrs) লাগাতে হয়। এটা ছোট আকারের পারিবারিক খামারে কোনো প্রয়োজন না হলেও বড় খামারে খুবই প্রয়োজন। পশুর জাত উন্নায়ন বা অন্য কোনো গবেষণা কাজে প্রতিটি গবাদিপশুর আলাদা তথ্য সংগ্রহ করা অত্যাবশ্যক। এজন্য বাছুরের মাতাপিতা অনুসারে চিহ্নিতকরণ খুবই প্রয়োজন। সীসার পাতে নম্বর থাকে যা বাছুরের কানে একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে পরিয়ে দেয়া হয়।

৩। পরিমিত খাদ্য পরিবেশন, মলমূত্র ও বিছানা পরিষ্কার করা

বাছুর প্রতিপালনে দৈহিক পরিমিত খাদ্য পরিবেশনের কোনো বিকল্প নেই। বর্ধিষ্ণু বাছুরের চাহিদা অনুসারে জন্ম থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত খাদ্য তালিকা অনুসারে নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। তাছাড়া স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে প্রতিপালনের জন্য বাছুরের শয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের ঘরটিতে মলমূত্র নিষ্কশনের যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে। কেননা মলমূত্র থেকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হতে হয় এবং এতে বাছুরের কৃমিসহ নানা ধরনের রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। যে বিছানা বাছুরের ঘরে বা খোপে দেয়া হয় তাও মাঝে মধ্যে পরিষ্কার করে শুকনো রাখতে হয়। স্যাঁতস্যাঁতে অবস্থায় এদের ফুসফুস প্রদাহ হয়ে থাকে। এতে স্কাউর রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

৪। বাছুর সময়মত খোপে ওঠানো ও নামানো

বাছুরের খোপে এদেরকে নিয়মিত ওঠানামা করাতে হয়। সারাদিন খোপে আবদ্ধ রাখা যেমন ঠিক নয় তেমনি দিনভর খোলা জায়গায় বিচরণ করতে দেয়াও উচিত নয়। এটা গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত মৌসুম নির্বিশেষে করা প্রয়োজন। বৃষ্টিতে ভেজা বা অতিরিক্ত ঠান্ডায় থাকলে বাছুরের ফুসফুস প্রদাহ রোগ হতে পারে।

৫। বাছুরের প্রাত্যহিক পর্যবেক্ষণ ও রোগচিকিৎসা

প্রাত্যহিক পর্যবেক্ষণ ও রোগব্যাধিতে নিয়মিত ওষুধ সেবন বাছুর পরিচর্যার অন্যতম করনীয় কাজ। তাছাড়া সময় সময় দৈহিক বৃদ্ধি বা অবনতি পরিমাপ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। জন্ম থেকে মাসিকভিত্তিতে দৈনিক ওজন পরিমাপ করা পশু

পরিচর্যার এক নিয়মমাফিক কাজ। এ কাজটি গ্রামীণ পারিবারিক খামরে সম্ভব না হলেও বৃহদাকার গরুর খামারে অত্যাবশ্যক কাজ হিসেবেই বিবেচিত। দৈহিক বৃদ্ধি বা ওজন তথ্য বাছুরের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তের পরিচায়ক।

বাছুরের খাদ্য পরিবেশন

বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাছুরের খাদ্য পরিবেশন

বাছুরের বয়স	পরিবেশনযোগ্য খাদ্য উপাদান
প্রথম ২ সপ্তাহ	সকাল ও বিকেলে মোট দুবার শালদুধ সরবরাহ করতে হবে।
৩-১২ সপ্তাহ	দিনে দুবার দুধ পান করাতে হবে। তাছাড়া তৃতীয় সপ্তাহ থেকে কিছু কচি পাতা, ঘাসের ডগা এবং ৮ম মপ্তাহ থেকে সামান্য দানাদার খাদ্য দিতে হবে।
১৩-১৬ সপ্তাহ	দিনে দুবার দুধ পান করাতে হবে। সেসাথে মাথাপিছু ৫০০ গ্রাম দানাদার ও ১.০ কেজি সবুজ ঘাস পরিবেশন করতে হবে।
১৭-২০ সপ্তাহ	দুধ পান দিনে দুবার। সেসাথে মাথাপিছু ৭৫০ গ্রাম দানাদার খাদ্য ও ৩.০ কেজি সবুজ ঘাস পরিবেশন করতে হবে।
২১-২৪ সপ্তাহ	দুধ পান দিনে দুবার। সেসাথে ১.০ কেজি দানাদার খাদ্য ও ৫.০-৭.০ কেজি সবুজ ঘাস দিতে হবে।
২৫-৩৫ সপ্তাহ	দুধ পান বন্ধ করতে হবে। কিন্তু ১.০-১.৫ কেজি দানাদার খাদ্য ৫.০-৭.০ কেজি সবুজ ঘাস ও ১.০-২.০ কেজি খড় খাওয়াতে হবে।
৩৬-৫০ সপ্তাহ	১.৫-২.০ কেজি দানাদার খাদ্য ১০.০-১২.০ কেজি সবুজ ঘাস ও ২.০-৩.০ কেজি খড় খাওয়াতে হবে।

বাছুরের খাদ্য পরিবেশনে যে অনুক্রম দেখানো হয়েছে তাতে সবুজ ঘাস পাতার পাশাপাশি দানাদার খাদ্যের উল্লেখ আছে।

বাছুরের দানাদার খাদ্যে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ-

খাদ্য উপাদান	পরিমাণ
গমের ভূষি	৫.০ কেজি
ছোলা চূর্ন	১.০ কেজি
খেসারি চূর্ণ	২.০ কেজি
সরগম চূর্ণ	৭০০ গ্রাম
সরিষার খৈল	১.০ কেজি
হাড় চূর্ণ	২০০ গ্রাম
লবণ	১০০ গ্রাম
মোট	১০.০ কেজি

দানাদার খাদ্যে যে উপাদান যুক্ত হয়েছে তার দু একটি উপাদান না পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিক ভাবে অন্য উপাদান যুক্ত করা চলে। যেমন সরগম এর পরিবর্তে চালের গুড়া ব্যবহার করা যায়। দানাদার খাদ্য মিশ্রণ একত্রে একাধিক বাছুরের জন্য তৈরি করে স্বল্প সময়ের জন্য সংরক্ষণও করা চলে। এ থেকে বাছুর পিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য বাছুরের খোপে প্রদত্ত পাত্রে সকালবিকেল পরিবেশন করা যায়।

বাছুরের রোগব্যাধি দমন

চিকিৎসা বিজ্ঞানে একটি প্রবাদ আছে রোগব্যাধির চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিরোধই শ্রেয়। বাছুর উৎপাদনেও একই প্রবাদ প্রযোজ্য। বাছুর প্রতিপালনে দুটো বিষয় উল্লেখ্যযোগ্য যথা- ১. রোগব্যাধির প্রতি অপেক্ষাকৃত প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন বাছুর

বাছাই করে প্রতিপালন করা ও ২. চিকিৎসার চেয়ে রোগব্যাধি দমনের প্রতি নজর দেয়া। বাছুরের রোগব্যাধি দমনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো যথাযথভাবে পালন করা উচিত। যথা-

- বাছুরের ঘরদোর, খাদ্য ও পানির পাত্র এবং অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। এদের গোবর ও চনা সঠিকভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
- বিভিন্ন বয়সের বাছুরকে আলাদা ঘরে বা খোপে পালন করতে হবে।
- সব সময় সুষম খাদ্য প্রদান করতে হবে। পঁচা বা বাসি খাবার সরবরাহ করা যাবেনা।
- কোনো বাছুরের মধ্যে অসুস্থতার লক্ষণ দেখা মাত্র তাকে আলাদা করে ফেলতে হবে এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- সংক্রামক রোগে মৃত বাছুরকে খামার থেকে দূরে মাটির নিচে গভীর গর্ত করে তাতে মাটি চাপা দিতে হবে এবং উপরিভাগে চুন বা ডি.ডি.টি. (DDT) ছড়িয়ে শোধন করতে হবে।
- সব বয়সের বাছুরকে নিয়মিত কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে ও সংক্রামক রোগপ্রতিরোধের জন্য টিকা প্রদান করতে হবে।

বাছুরে রোগব্যাধির প্রকোপ বড় গরুর তুলনায় বেশি। সেজন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরও কোনো না কোনো রোগব্যাধিতে এরা আক্রান্ত হতে পারে। তাছাড়া কিছু রোগ আছে যা শুধু বাছুরেরই হয়ে থাকে। বাছুরের রোগপ্রতিরোধ ও চিকিৎসার ব্যাপারে স্থানীয় ভেটেরিনারি সার্জনের সাথে পরামর্শ করা যেতে পারে। এ পাঠে শুধু বাছুরে হয় এমন কিছু রোগব্যাধি আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে নবজাত বাছুরের যত্ন নিয়ে আলোচনা করবে এবং জানবেন।

সারসংক্ষেপ

জন্মের পর থেকে এক বছরের কিছু বেশি বয়সের গরুমহিষের বাচ্চাই বাছুর। বাছুরের শারীরবৃত্ত ও শারীরিক গঠন বৈশিষ্ট্য, বয়স, খাদ্যভ্যাস, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, আবহাওয়া, রোগবালাই সংক্রমন হওয়ার সম্ভাব্যতা প্রভৃতি বিবেচনা করে বাসস্থান তৈরি করতে হয়। আমাদের দেশী গাভীর বাছুর ও উন্নত সংকর জাতের বাছুরে জন্মের ওজন যথাক্রমে ১৫-২০ ও ২৫-৩০ কেজি হয়। বাছুরের বাসস্থানে এদেরকে খোপে রেখে পালন করা যায়। একেকটি বাছুরের জন্য খোপের পরিসর হবে ০.৯১ মিটার × ১.২২ মিটার × ১.০৭ মিটার। নিয়মিত খাদ্য পরিবেশন, রোগবালাই মুক্ত রাখা, দেখাশোনা করা ইত্যাদিকে বাছুরের পরিচর্যা বলে। বাছুর পরিচর্যার কলঅকৌশলগুলোর মধ্যে এদেরকে গাভীর দুধ পান করতে শেখানো, খামার পর্যায়ে বাছুর চিহ্নিতকরণ, পরিমিত কাদ্য পরিবেশন, মলমূত্র ও বিছানা পরিষ্কার করা, সময়মতো খোপে ওঠানো ও নামানো, প্রাত্যহিক পর্যবেক্ষণ ও রোগচিকিৎসা করা ইত্যাদি প্রধান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোন্ বয়সের গরুমহিষের বাচ্চাকে বাছুর বলে?
(ক) জন্মের পর থেকে এক বছরের কিছু বেশি
(খ) জন্মের পর থেকে এক বছরের কিছু কম
(গ) জন্মের পর থেকে দুবছরের কিছু কম
(ঘ) জন্মের পর থেকে দুবছরের কিছু বেশি

২। আমাদের দেশের বাছুরের জন্মের ওজন কত?
(ক) গড়ে ১০-১৫ কেজি
(খ) গড়ে ১৫-২০ কেজি
(গ) গড়ে ২০-২৫ কেজে
(ঘ) ২৫-৩০ কেজে

পাঠ-১৪.৫ দুধ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিশুদ্ধ দুধ উৎপাদনের শর্তসমূহ জানবেন।
- ভেজাল দুধ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- কি উপাদান দ্বারা দুধ ভেজাল করা হয়েছে তা বলতে পারবেন।
- দুধ সংরক্ষনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত হবে।
- দুধ শীতলীকরনের প্রক্রিয়াসমূহ জানবেন।
- দুধ সংরক্ষনের গ্রামীন পদ্ধতিগুলো বলতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ননী, বিষমুক্ত, অম্লতা, ক্লট অন বয়েলিং

স্বাস্থ্যবতী গাভীর বাচ্চা প্রসবের ১৫ দিন পূর্বে এবং বাচ্চা প্রসবের ৫ দিন পরে গাভীর ওলান হতে নিঃসুত কলস্ট্রাম মুক্ত যে তরল পদার্থ পাওয়া যায় তাকে দুধ বলে। দুধ একটি আদর্শ খাদ্য। এটি শিশু, নারী, বৃদ্ধ এবং সকল বয়সের নারী পুরুষের জন্য প্রযোজ্য। দুধের পুষ্টিগতমান অনেক বেশি। দুধ দেহের মাংসপেশি, হাড় তৈরি করতে এবং শক্তি যোগাতে সাহায্য করে। দুধ শিশুদের মস্তিস্ক বিকাশে সাহায্য করে। দুধে এমন কতগুলো খাদ্যপ্রাণ আছে যা অন্য কোনো খাদ্যে পাওয়া যায়না।

দুধে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন এ, ডি, এবং রাইকেফ্ল্যাভিন আছে যা শিশুদের হাড় ও দাঁত মজবুত করে এবং দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে। দুধ মৃদু মিষ্ট ও অতি সামন্য লবানাক্ত। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ খাদ্য হিসাবে দুধের গুরত্ব অপরিসীম। শিশুর বৃদ্ধি, যুবকের শক্তি বৃদ্ধের জীবন ধারন এবং অসুস্থ ব্যক্তির পথ্যের ক্ষেত্রে দুধের ওপর নির্ভরতা উল্লেখযোগ্য। সুতরাং দুগ্ধ উৎপাদনকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, বিতরনকারী এবং খুচরা বিক্রেতাগণের প্রধান উদ্দেশ্য হবে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে উচ্চমান সম্পন্ন অবস্থায় ভোক্তাদের নিকট পৌছে দেয়া।

৬.১ বিশুদ্ধ দুধ উৎপাদনের শর্তসমূহ

পানি : গরুর জন্য ব্যবহৃত পানি অবশ্যই বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার হতে হবে। বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত পানি গরুর পানের জন্য ব্যবহার করতে হবে। গরুর গোসলের পানি ও খামার পরিষ্কারের পানি অবশ্যই জীবাণুমুক্ত হতে হবে।

বিষমুক্ত সুষম খাবার : গরুর স্বাস্থ্য রক্ষা ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন সুষম খাদ্য যাতে সকল প্রকার পুষ্টি বিদ্যমান থাকবে। যা সহজে পচ্য, দাম তুলনা মূলক কম ও গরুর পছন্দনীয় হবে।

স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান : আরামদায়ক পরিবেশ প্রদান। বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা করবে। পরিচর্যা ও স্বাস্থ্য সম্মত খাদ্য গ্রহনের জন্য বাসস্থান অপরিহার্য।

পাত্রের পরিচ্ছন্নতা : খাদ্যের পাত্র প্রতিদিন পরিষ্কার রাখতে হবে। দুধ দোহনের পাত্র পরিষ্কার ও শুকনো হতে হবে। প্রয়োজনে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে।

দুগ্ধ দোহনকারীর পরিচ্ছন্নতা : যিনি দুধ দোহন করবেন তার শরীর ও হাত পরিষ্কার পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে। দোহনকারীর হাতের নখ অবশ্যই ছোট রাখতে হবে।

বাসস্থানের চালার পরিচ্ছন্নতা : যে ঘরে গাভীর দুধ দোহন করা হবে সেটি অবশ্যই পরিষ্কার, শুকনো, ধুলাবালি বিহীন এবং ঠান্ডা বা ছায়াযুক্ত হতে হবে।

স্তন প্রদাহ পরিক্ষা : গাভীর দুধের বাট ও ওলান নিয়মিত বিরতিতে পরীক্ষা করতে হবে। স্তন প্রদাহ আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে। যদি থাকে তাহলে চিকিৎসকের দেয়া নির্দেশনা মোতাবেক দুধ সংগ্রহ ও গরুর পরিচর্যা করতে হবে।

৬.২ কাঁচা দুধ পরীক্ষা

পরীক্ষার জন্য দুধ স্যাম্পলিং (নমুনা সংগ্রহ)

সঠিক স্যাম্পলিং এর পূর্বশর্ত হলো ছোট দুধের পাত্র বা বড় ট্যাঙ্কারের মধ্যে তরল দুধ সঠিকভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। তবে এ কাজটি স্যাম্পলিং করার আগে করতে হবে যেন দুধের গুণগত মান সঠিকভাবে পরীক্ষা করা যায়।

ইন্দ্রিয় ভিত্তিক পরীক্ষা (organoleptic test)

ইন্দ্রিয় ভিত্তিক পরীক্ষা সহজে ও দ্রুত খাটি দুধ ও ভেজাল দুধ পৃথক করতে সাহায্য করে। ইন্দ্রিয় ভিত্তিক পরীক্ষার জন্য কোন যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। শুধু যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় ভিত্তিক পরীক্ষা করবে তার দুধের দর্শন, গন্ধ ও স্বাদ সমন্ধে ভাল ধারনা থাকতে হবে।

পরীক্ষা পদ্ধতি

১) প্রথমে দুধের বোতল বা জারের মুখ খুলতে হবে।
২) দ্রুততার সাথে দুধের গন্ধ বা স্বাদ নিতে হবে।
৩) দুধের বাহ্যিক গঠন অনুসন্ধান করতে হবে।
৪) যদি এর পরে ও কোন সন্দেহ থাকে তবে তা পান না করে দুধের নমুনা মুখে নিয়ে স্বাদ গ্রহন করতে হবে, কিন্তু গিলে ফেলা যাবে না।

দুধের রাসায়নিক পরীক্ষা

১) সি এল আর (CLR) পরীক্ষা/আপেক্ষিক গুরুত্বের পরীক্ষা
২) এসিড পরীক্ষা
৩) এলকোহল পরীক্ষা
৪) সি ও বি (COB) পরীক্ষা

পরিক্ষার নাম	উদ্দেশ্য	প্রয়োজনী যন্ত্রপাতি	প্রয়োজনী রাসায়নিক বিকারক	সতর্কতা পরিক্ষা
সি এল আর (সংশোধিত ল্যাকটোমিটার যন্ত্রের পাঠ) পরীক্ষা	ক) দুধের মৌলিক প্রকৃতি নির্ধারণ খ) দুধের ভেজাল প্রকৃতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহন।	ক) দুধ খ) ননিযুক্ত দুধ গ) আংশিক ভেজাল যুক্ত দুধ	ক) ল্যাকটোমিটার খ) বয়াম/পাত্র গ) থার্মোমিটার ঘ) বিকার	ক) দোহনের দুই ঘন্টা পর দুধ পরীক্ষা করতে হবে। খ) দুধের তাপমাত্রা ২০-৩০° সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকতে হবে। গ) নমুনা সম্পূর্নরুপে মিশ্রিত করতে হবে। ঘ) উন্নতমান দুগ্ধ পরিক্ষার যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে। ঙ) দুগ্ধ পরিক্ষার যন্ত্রে দুধ সীমিত সময়ের জন্য রাখতে হবে।

পরীক্ষা পদ্ধতি

১. নমুনা দুধের তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এ সমন্বয় করতে হবে।
২. প্রথমে একটি পরিষ্কার শুষ্ক কাচের জারে ২/৩ অংশ দুধ দ্বারা পূর্ণ করতে হবে।
৩. এরপর অবাধে জারের পাশ স্পর্শ ছাড়া ল্যাকটোমিটার এমনভাবে ভাসাতে হবে যেন তা দুধ স্পর্শ করে ভেসে থাকে।
৪. এরপর জার সম্পূর্ন রুপে দুধ দ্বারা পূর্ন করতে হবে।

৫. এক মিনিটের মধ্যে ল্যাকটোমিটারে পাঠ নিতে হবে।
৬. দুধের তাপমাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

গণনা

দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা নির্ণয় করা যায় :

$$\text{আপেক্ষিক গুরুত্ব} = \frac{\text{সংশোধিত ল্যাকটোমিটার যন্ত্রের পাঠ}}{১০০০} + ১$$

সংশোধিত ল্যাকটোমিটার যন্ত্রের পাঠ = এল, আর + সি.এফ (এল. আর : ল্যাকটোমিটার রিডিং + সি.এফ : কারেকশন ফ্যাক্টর)

সি. এফ (+)= ০.২ × দুধের তাপমাত্রা ২০° সেলসিয়াস থেকে যতটুকু বেশি

সি. এফ (-) = ০.২ × দুধের মাপমাত্রা ২০° সেলসিয়াস থেকে যতটুকু কম।

দুধ সংরক্ষণ

সুস্থ সবল গাভীর ওলানের দুধে সামান্য কিছু ব্যাকটেরিয়া থাকে। দুধ সংগ্রহ থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ করার মধ্যবর্তী সময়ে দুধে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বাড়তে থাকে। এই সব ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা নির্ভর করে দুধ দোহন পদ্ধতি ও দুধ পরিবহনের মানের উপরে। ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধির হার ও দুধের পচনের উপর দুধের তাপমাত্রার গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সাধারনত বলা যায় যে, যদি দুধ ঠান্ডা/শীতল না করা হয় ও দুধ দোহনের পরবর্তী ৫ ঘন্টার মধ্যেও সংরক্ষণ করা না হয়, তবে সেই দুধ আর প্রক্রিয়াজাত করার উপযোগী থাকে না। বাংলাদেশের এমন অনেক এলাকা রযেছে যেখানে বিশুদ্ধ/টাটকা দুধ শীতলীকরন কষ্টদায়ক। দুধ দোহনের পর প্রক্রিয়াজাতকরন শিল্পে পৌছানোর মধ্যবর্তী সময়টা খুবই সংকটাপূর্ণ কারন এই সময়ের মধ্যে দুধের পচন শুরু হয় ও গুনগতমান অধিকতর মন্দ হতে থাকে। বাংলাদেশে বেশিরভাগ দুধই উৎপাদন হয ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী/কৃষক দ্বারা এবং এই অল্প পরিমানের দুধ সংগ্রহ ও বিলি করা সময়মাপেক্ষ ব্যাপার এবং কঠিন। এখানে কৃষক দুধ একটি নির্দিষ্ট সংগ্রহ কেন্দ্রে জমা দেয় যেখানে দুধ পরিমাপও রেকর্ড গ্রহন করা হয় এবং মাঝে মধ্যে দুধ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে এর গুনগতমান যাচাই করা হয়। এই সমস্ত দুধ পরবর্তীতে শীতলীকরন হয়। পরে এই সংগ্রহীকৃত শীতলীকৃত দুধ ট্রাকের মাধ্যমে দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে পাঠানো হয়। এই ভাবে দুধ সংগ্রহ থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে পৌছাতে সময় লাগে পাঁচ ঘন্টারও বেশি, ফলে দুধের গুনগতমানের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং প্রায়ই প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এই সমস্ত দুধ প্রত্যাখান করে এবং এই সমস্ত দুধ ভোক্তাদের কাছেও গ্রহনযোগ্য হয় না। ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি কমানোর জন্য শীতলীকরন সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি। শীতলীকরন পদ্ধতিতে দুধের গুনগত মান বজায় থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই পদ্ধতিটি খুবই ব্যয়বহুল ও সংবেদনশীল। আবার কোন কোন দেশে এটি অসম্ভব পদ্ধতি। যেখানে শীতলীকরন পদ্ধতি সম্ভবপর নয় সেখানে কিছু বিকল্প পদ্ধতির ব্যবহার করা খুবই জরুরি।

দুধ সংরক্ষণ পদ্ধতিসমূহ

দুধ সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. **মাটির কলসির ব্যবহার:** মাটির কলসিতে করে দুধ রাখালে দুধের তাপমাত্রা প্রকৃতির তাপমাত্রার তুলনায় তুলনামূলক ভাবে অনেক কম থাকে ফলে গুনগত মান ও অক্ষুন্ন থাকে। মাটির কলসিতে করে দুধ রাখালে কয়েক ঘন্টা সংরক্ষণ করা যায়।
২. **টিউবয়েলের নিকট মাটি চাপা দিয়ে:** কোন মুখবন্ধ পাত্রে দুধ নিয়ে সেটি যদি টিউবয়েলের নিকট ভেজা মাটি দিয়ে চাপা দেয়া হয় তবে দুধের তাপমাত্রা অনেক কম থাকে ও দুধ প্রায় কয়েক ঘন্টা ভাল থাকে।
৩. **কলাপাতা ও খেঁজুরের পাতার ব্যবহার:** দুধ দোহনের পর কলাপাতা ও খেঁজুরের পাতা দিয়ে রাখালে পাতার সাদা সাদা চুনের মত পদার্থ দুধের অম্লত্ব কমায়। কারন এগুলো ক্ষারীয় পদার্থ ফলে দুধের সংরক্ষনকাল স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়ে যায়।
৪. **ল্যাকটো পারঅক্সিডেজ পদ্ধতি:** ল্যাকটো পারঅক্সিডেজ দুধের একটি এনজাইম যেটি স্বাভাবিক ভাবেই দুধের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। ল্যাকটো পারঅক্সিডেজ সক্রিয়করন পদ্ধতিটি থায়ো সায়ানেট (১৫ পিপি এম) ও হাইড্রোজেন পারঅক্সিডেজ (৮.৫ পিপিএম) দুধের মধ্যে যুক্ত করার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হযেছে। এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় দুধের স্থায়ীত্বকাল বেড়ে সাত থেকে আট ঘন্টা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে বিশুদ্ধ দুধ উৎপাদনের শর্তসমূহ নিয়ে আলোচনা করবে এবং ব্যাবহারিকবাবে দুধ পরীক্ষা করবেন।

সারসংক্ষেপ

দুধ প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি অন্যতম শ্রেষ্ঠ খাবার। দুধে ৩-৫ ননী বা চর্বি এবং ৮.৫% ননীমুক্ত অন্যান্য উপাদান থাকে। বিশুদ্ধ দুধ উৎপাদনের জন্য দুগ্ধবতী গাভীকে পর্যাপ্ত পরিমান পানি, সুষম খাদ্য এবং পরিচ্ছন্নতার প্রতি সজাগ থাকতে হবে। কাঁচা দুধ ইন্দ্রিয়ভিত্তিক এবং রাসায়নিক ভাবে পরীক্ষা করা যায়। ইন্দ্রিয় ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে দুধের দর্শন, গন্ধ ও স্বাদ সম্বন্ধে দ্রুত ধারনা পাওয়া যায়। রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে দুধের বিশুদ্ধতা এবং ভেজাল নির্নয় করা যায়। দুধ সংগ্রহের পরবর্তী ৫ ঘন্টার মধ্যে সংরক্ষন না করা হলে দুধ নষ্ট হয়ে যায়। শীতলীকরন পদ্ধতিতে দুধের গুনগত মান বজায় থাকে। মাটির কলসি টিউবয়েলের নিকট মাটি চাপা দিয়ে কিংবা কলা পাতা ও খেজুর পাতা ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামে কুব সহজেই দুধ শীতল রাখা যায়। ল্যাকটো পার অক্সিডেজ এনজাইম ব্যবহারের মাধ্যমেও দুধ সংরক্ষন করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৫

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। CLR পরীক্ষায় দুধের তাপমাত্রা কত হবে?
(ক) ১০-২০°C (খ) ১৫-২০°C
(গ) ২০-৩০°C (ঘ) ৩০-৪০°C

২। দুধ সংগ্রহের কত ঘন্টার মধ্যে শীতল করতে হয়।
(ক) ৪-৫ ঘন্টা (খ) ৬-৭ ঘন্টা
(গ) ৭-৮ ঘন্টা (ঘ) ৮-১০ ঘন্টা

৩। ল্যাকটোপার অক্সিডেজ সক্রিয়করন পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন পারঅক্সিডেজের পরিমান কত?
(ক) ৬.৫ ppm (খ) ৭.৫ ppm
(গ) ৮.৫ ppm (ঘ) ৯.৫ ppm

পাঠ-১৪.৬ দুধ উৎপাদনে প্রভাবক বিষয়সমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দুধ উৎপাদন বৃষ্টির নিয়ামকসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- দুধ উৎপাদনের সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	উৎপাদন, প্রভাবক, ড্রাই পিরিয়ড, সুষম খাদ্য

দুধ হলো আদর্শ খাদ্য, যা খাদ্যের প্রায় সব উপাদান বহন করে। সুস্থ ববল গাভী থেকে পরিমিত দুধ পাওয়া যায়। আমাদের দেশের গাভীগুলোর দুধ উৎপাদনক্ষমতা অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। এর পেছনে কিছু পরিবেশ ও জাতগত কারণ রয়েছে। এক এক জাতের গাভীর দুধ উৎপাদনক্ষমতা একেক রকম। জাত ছাড়াও অন্য বিষয় আছে, যা দুধ উৎপাদন বাড়াতে সহায়ক। আগে জেনে নেয়া যাক কোন বিষয়গুলোর ওপর দুধ উৎপাদন নির্ভরশীল।

গাভীর আকার : গাভীর আকারের ওপর উৎপাদন অনেকটা নির্ভর করে। সাধারণত বড় আকারের গাভী থেকে বেশি দুধ পাওয়া যায়।

পুষ্টি : গাভীর পুষ্টির ওপর অনেকাংশে দুধ উৎপাদন নির্ভর করে। দুধ নিঃসারক কোষে দুধ সৃষ্টি করতে পারে যদি পর্যাপ্ত পুষ্টি পায় আর গাভীর পুষ্টির উৎস দুটি- তার নিজের দেহ এবং খাদ্য।

বাছুর প্রসবের সময় : বাছুর প্রসবের সময়ের ওপর দুধ উৎপাদন নির্ভর করে। শরৎকালে গাভীর বাচ্চা প্রসবে বসন্ত ঋতুতে প্রসব অপেক্ষা প্রায় ১০% অধিক দুধ উৎপাদিত হয়। এর কিছু আবহাওয়াগত কারণ রয়েছে।

বয়স : সাধারণত গাভী তার তিন থেকে ছয় (বাছুর সংখ্যা) দুধকাল সর্বোচ্চ পরিমাণ দুধ দেয়।

স্বাস্থ্য : গাভীর স্বাস্থ্য ভালো থাকলে দুধ উৎপাদন অনেকটা ভালো হয়।

আদর্শ ব্যবস্থাপনা : দুধ দোহনের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং বাসগৃহ ও অন্যান্য সামগ্রীর পরিচালনা দুধ উৎপাদনে প্রভাব রয়েছে।

ড্রাই পিরিয়ড বৃদ্ধি : ড্রাই পিরিয়ড বলতে গাভীর বাছুর বড় হওয়ার পর থেকে পুনরায় গর্ভবতী হওয়ার আগ পর্যন্ত সময়কে বোঝায়। এই সময় সাধারণত ৫০-৬০ দিন হলে ভালো হয়। এই সময়ে গাভী তার দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে এবং পরবর্তী বাছুরের জন্য নিজের দেহকে সুষ্ঠুভাবে তৈরি করতে পারবে। আজ এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে, ড্রাই পিরিয়ড বৃদ্ধি পেলে দুধ উৎপাদন বাড়ে।

সুষম খাদ্যের সরবরাহ : গর্ভবতী গাভীর জন্য প্রয়োজন সুষম খাদ্য সরবরাহ। এ সময় প্রচুর পরিমাণ পুষ্টি প্রয়োজন, যা গাভীর নিজের ও বাছুরের জন্য খুবই গুরুত্বপুর্ণ। গাভীর পুষ্টির ওপর নির্ভর করে দুধ উৎপাদনক্ষমতা ও বাচ্চার দেহের গঠন। তাই গর্ভবতী গাভীকে বিশেষভাবে সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ : দেহের পরিপাকতন্ত্র সঠিকভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সুষম পানি প্রয়োজন। পরিমিত পানি দেহের মেটাবলিজম ঠিক রাখে।

প্রসবকালে গাভীর পরিচর্যা নিশ্চিত করা : গাভীর বাছুর প্রসবকালে নিতে হবে বাড়তি পরিচর্যা। এ সময় গাভীকে নরম বিছানার (খড় বিছিয়ে) ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণত বকনা গরুর ক্ষেত্রে প্রথম বাছুর প্রসবকালে সমস্যা একটু বেশি হয়। তাই বাছুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাভীকে কিছু কুসুম গরম পানি ও তার সঙ্গে ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ কিছু খাওয়াতে হবে। এতে গাভীর শরীর ঠিক থাকে। এ সময় মিল্ক ফিভার (দুধ জ্বর) যাতে না হয় সে জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালসিয়াম খাবারের সঙ্গে দিতে হবে। বাছুর প্রসবের প্রায় এক সপ্তাহ আগে ভিটামিন ডি খাওয়ালে গাভীর জন্য সহায়ক হয়।

গাভীকে নিয়মিত পরিষ্কার রাখা : বাছুর প্রসবের পর গাভীকে সঠিকভাবে গোসল করাতে বা পরিষ্কার করতে হবে। শীতের দিন হলে হালকা গরম পানি দিয়ে হলেও পরিষ্কার করতে হবে; যা দেহের বহি:পরজীবী দূর করতে এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। আর তাপমাত্রার সঙ্গে দুধ উৎপাদনের একটা সম্পর্ক রয়েছে। বাছুর প্রসবের পর এমনিতেই দেহের দুর্বলতা

প্রকাশ পায়। এর সুযোগ নিয়ে জীবাণু সহজে বংশ বিস্তার ও রোগ ছড়াতে পারে। আর জীবাণু পরজীবীর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ হলো অপরিচ্ছন্নতা। সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। নিয়মতি পরিষ্কার রাখতে হবে। গরমকালে প্রতিদিন না হলেও সপ্তাহে অন্তত দুবার গোসল করানো ভালো। শীতকালে তেমন সম্ভব না হলে ব্রাশ দিয়ে শরীরের লোম পরিষ্কার করতে হবে। এতে লোমের অর্থাৎ সারা শরীরে রক্তপ্রবাহ ঠিক থাকে, যা দুধ উৎপাদনে সহায়ক।

গাভীর বাসস্থান পরিচ্ছন্ন রাখা : যে স্থানে গাভীকে রাখা হয় তার ওপর গাভীর স্বাস্থ্য ও দুধ উৎপাদন অনেকটা নির্ভর করে। ভালো ভ্যানটিলেশন, শুকনো ও স্যাঁতসেঁতেমুক্ত পরিবেশে গাভীকে রাখতে হবে। এতে লোমের অর্থাৎ সারা শরীরে রক্তপ্রবাহ ঠিক থাকে, যা দুধ উৎপাদনে সহায়ক। বাচ্চা প্রসবের আগে ও পরে কিছু দিন বাসস্থানকে আগে আরামদায়ক করতে শুকনো খড় ব্যবহার করা উত্তম। ময়লা-আবর্জনা যেখানে সেখানে রাখা উচিত নয়। এতে কৃমি বৃদ্ধি পেতে পারে। সপ্তাহে অন্তত দুবার ব্লিচিং পউডার দিয়ে গাভীর স্থানের মেঝে পরিষ্কার করতে হবে। এতে জীবাণুর প্রাদুর্ভাব অনেকাংশে কমানো যায়।

পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাসের সরবরাহ করা : গাভীর দুধ উৎপাদন বাড়াতে কাঁচা ঘাসের কোনো বিকল্প নেই। সুষম খাদ্যের পাশাপাশি কাঁচা ঘাস দুধ উৎপাদন বাড়ায়। ঘাসের বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ও মিনারেল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের উপস্থিতিতে দুধের উৎপাদন বাড়ায়।

নির্দিষ্ট সময়ে দোহন করা : প্রতিদিন একই সময়ে দুধ দোহন করলে এর উৎপাদন ভালো থাকে। গাভীর দেহের হরমোন তখন ভালো কাজ করতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ে একই ব্যক্তি দ্বারা দুধ দোহন করলে দুধ উৎপাদনের মান ভালো থাকে বলে প্রমাণিত কয়েছে। অন্য ব্যক্তি বা পদ্ধতির পরিবর্তন হলে গাভী অনেকটা বিরক্ত হয়। ফলে দুধ উৎপাদন কমে যায়।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দোহন শেষ করা : দুধ নিঃসরণের সঙ্গে জড়িত হরমোন অক্সিটোসিন মাত্র ৮ মিনিট কাজ করে। এ জন্য ওই সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ দুধ পেতে দোহন শেষ করতে হবে।

ভিটামিন ও মিনারেল প্রিমিক্স খাওয়ানো : বর্তমানে বাজারে অনেক ধরনের মিক্সড পাউডার পাওয়া যায়, যা ভিটামিন, মিনারেলের ঘাটতি পূরণ করে দুধ উৎপাদন বাড়ায়। ভিটামিন ডি, বি-সহ বিভিন্ন নামে বাজারে পাওয়া যায়; যা খাবারের সঙ্গে সরবরাহ করতে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে দুধ উৎপাদনে প্রবাবক বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করবে এবং জানবেন।

সারসংক্ষেপ

দুধ অন্য যে কোন খাদ্য উপাদান থেকে শ্রেষ্ট। দুগ্ধবতী গাভীর জন্য সুষম খাদ্য অপরিহার্য। বিশেষ করে কাঁচা ঘাস যোগানের মাধ্যমে দুধের পরিমান ও গুনগত মান বাড়ানো যায়। সুষম খাদ্যের পাশাপাশি গাভীর স্বাস্থ্য, জৈব নিরাপত্তা ও বসবাসের পরিবেশের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৬

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। গাভী তার কত বাছুর সংখ্যা পর্যন্ত সর্বোচ্চ দুধ দেয়?

(ক) ১-২ (খ) ২-৩

(গ) ৩-৬ (ঘ) ৪-৭

২। গাভীর ড্রাই পিরিয়ড কত দিন হরে উত্তম?

(ক) ৪০-৫০ দিন (খ) ৫০-৬০ দিন

(গ) ৬০-৭০ দিন (ঘ) ৭০-৮০ দিন

পাঠ-১৪.৭ ব্যবহারিক : বাণিজ্যিক ডেইরি ফার্ম পরিদর্শন ও প্রতিবেদন তৈরি

মূলতত্ত্বঃ বাণিজ্যিক গাভী পালন করতে হলে গাভীর জন্য ভাল বাসস্থান প্রয়োজন। বাণিজ্যিক খামার বড় রাস্তার পাশে উঁচু জায়গায় করতে হয় যাতে বৃষ্টির পানি না জমে এবং দুধ দোহনের পর তাড়াতাড়ি স্থানান্তর করা যায়। প্রোটিনের চাহিদা পূরণে দুধের কোন বিকল্প নেই। আর তার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নত জাতের দুধাল গাভী পালন। ব্যবহারিক পাঠের এ অংশে একটি বাণিজ্যিক ডেইরি খামার পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উন্নত জাতের গাভী পালনের জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

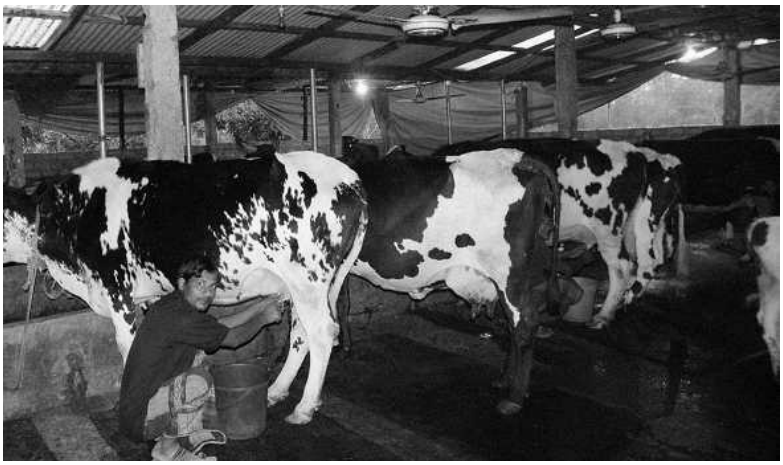

চিত্র-১৪.৭.১ : ডেইরি ফার্ম

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. একটি বাণিজ্যিক খামর
২. খাতা, কলম ইত্যাদি

কাজের ধারা

১. প্রথমে শ্রেণীশিক্ষরের সাথে কয়েকজন ছাত্র মিলে একটা দল গঠন করে কলেজের নিকটবর্তী কোন বাণিজ্যিক ডেইরি খামর পরিদর্শনে বের হন।
২. খামার বিভিন্ন জাতের গাভী এবং তাদের ঘর পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে খাতায় নোট করুন।
৩. খামারের গাভীর খাদ্য প্রদান ও অন্যান্য লালন পালন ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে খাতায় লেখুন।
৪. গাভীর রোগ- ব্যাধির চিবিৎসা ও টিকা প্রদান সম্বন্ধে খামার তত্ত্বধায়কের নিকট থেকে জেনে নিন।
৫. খামারের দৈনিক কার্যক্রম, উৎপাদন, আয় ও খরচের হিসাব রেজিস্টার খাতা দেখে বুঝে নিন এবং নোট করুন।
৬. খামারের দুধ দোহন পদ্ধতি ও পরিমাণ জেনে নিন।
৭. খামারের অন্যান্য স্বাস্থ্যসম্মত পালন ব্যবস্থা খাতায় নোট করুন।

সাবধানতা

১. খামার তত্ত্বাবধায়কের অনুমতি ছাড়া খামারের কোন জিনিসপত্রে হাত না দেওয়া বা ব্যবহার না করা।
২. গবাদি পশুগুলোকে অযথা বিরক্ত না করা।

খামারের সমস্ত কার্যক্রম দক্ষতার সাথে পর্যবেক্ষণ করা।

পাঠ-১৪.৮ ব্যবহারিক : গর্ভবতী গাভী শনাক্তকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- লক্ষন দেখে কিভাবে গর্ভবতী গাভী সনাক্ত করা যায় তা জানবেন।
- গভীবতী গাভীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য সমূহ বলতে পারবেন।

মূলতত্ত্বঃ প্রাকৃতিক উপায়ে বা কৃত্রিম পদ্ধতিতে গাভীকে প্রজনন করার পরও অনেক সময় গর্ভধারণ সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়। কারন গর্ভধারণের কাল পাঁচ মাসের কম হলে বাইরের লক্ষণের উপর পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না। তাই গর্ববতী গাভী নির্ধারণ সত্যিই একটি কঠিন ব্যপার। ব্যবহারিক পাঠের এ অংশে আপনারা লক্ষণ দেখে একটি গর্ভবতী গাভী কি ভাবে শনাক্ত করা যায়, তা শিখতে পারবেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. একটি গর্ভবতী গাভী
২. খাতা, কলম ইত্যাদি

কার্যপদ্ধতি

গাভীকে শান্তভাবে দাঁড় করে নাও এবং নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো পর্যবেক্ষণ করুন।

১. গাভী ষাঁড়ের কাছে থাকতে পছন্দ করে কিনা।
২. গাভীর পেট স্বাভাবিকের চেয়ে বড় কিনা লক্ষ করুন।
৩. তিন মাস বয়সের পর থেকে পেটের ভেতর কিছু নড়াচড়া করে কিনা।
৪. দুধ ধীরে ধীওে কমে যায় কিনা।
৫. যৌনাঙ্গ ফলে যায়, ঝুলে পড়ে এবং নরম হতে থাকে কিনা খেয়াল করুন।
৬. খয়েরী রঙের মল ত্যাগ করে কিনা দেখুন।
৭. বাঁট ধরে টান দিলে কলার কসের মত আঠালো পদার্থ বের হয় কিনা পরীক্ষা কর।
৮. দূর্বা ঘাসের উপর কয়েকদিন প্রস্রাব করালে ঘাস হলুদ হয়ে যায় কিনা।

এসব লক্ষণগুলো যদি নির্বাচিত গাভীর সাথে মিলে যায় তবে বুঝে নিতে পারেন যে গাভটি গর্ভবতী।

সাবধানতা

১. গাভীটি শান্ত করে নিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে নিন।
২. খুব সাবধানে লক্ষণগুলো পর্যবেক্ষণ করতে হবে যাতে কওে বাচ্চার কোন ক্ষতি না হয়।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। চাঁনমিয়ার দুটি গর্ভবতী গাভী আছে। কিন্তু সঠিক পরিচর্যার জ্ঞান ছিলনা। উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ নিতে গেলেন। তিনি গর্ভবতী গাভির যত্ন ও পরিচর্যা সম্পর্কে সুন্দর পরামর্শ দিলেন। এছাড়াও দুগ্ধবতি গাভীর যত্ন ও সঠিক দুধ দোহন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দিলেন।

ক) উন্নত জাতের গাভীর লক্ষণ কী?

খ) গর্ভবতী গাভীর পরিচর্যা ব্যাখ্যা করুণ।

গ) দুগ্ধবতী গাভীর পরিচর্যার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) বিশুদ্ধ দুধ উৎপাদনের শর্তসমূহ বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.১ ঃ ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.২ ঃ ১। গ ২। গ ৩। গ ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৩ ঃ ১। ক ২। গ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৪ ঃ ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৫ ঃ ১। গ ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৬ ঃ ১। গ ২। খ